Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-II, published on April 2023, Page No. 89 – 95
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848

বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্পে পতিতা ও পতিতা বৃত্তি : ঔপনিবেশিক পর্ব

মৌসুমী বনিক
গবেষিকা, ইতিহাস বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল : banerjeebanikmousumi@gmail.com

Keyword
ঔপনিবেশিক সময়, পতিতাবৃত্তি, বাংলাসাহিত্য, ছোট গল্প, প্রহসন, বটতলার সাহিত্য, উনিশশতক, বাবুসম্প্রদায়।

Abstract
পতিতাবৃত্তি পৃথিবীর সব থেকে পুরোনো পেশা গুলির মধ্যে একটি। বলা যেতে পারে, সভ্যতার সূচনা লগ্নেই এই পেশার উৎপত্তি ঘটে। পতিতাবৃত্তি ও সভ্যতা যেন একই মুদ্রার দুটি দিক। তা সত্ত্বেও সভ্য সমাজ ও সভ্য সমাজে থাকা মানুষরা কখনোই পতিতা বৃত্তিকে সেইরূপ সম্মান দেয় নি, বরং এই পেশা ও এই পেশার সাথে যুক্ত মানুষদের তারা চিরকালই অবজ্ঞার চোখে দেখেছে। ঋকবৈদিক যুগ হতেই ভারতীয় সমাজে পতিতা ও পতিতা বৃত্তির অস্তিত্বের কথা আমরা জানতে পারি। ঋকবৈদিক সাহিত্যে সাধারণী, সামান্যা প্রভৃতি নামের উল্লেখ আছে। পরবর্তী বৈদিকসাহিত্যে গণিকা, বন্ধকী, রূপজীবা, বারাঙ্গনা প্রভৃতি নামগুলি হতে পতিতাবৃত্তির কথা জানা যায়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে গণিকা ও গণিকাবৃত্তির বিস্তৃত আলোচনা আছে। এভাবেই প্রাচীন হতে মধ্য সব যুগেই এই পেশা তার অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। লক্ষ্যনীয় বিষয় ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার পর কলকাতা শহর ও তৎসংলগ্ন মফঃস্বল শহরের পরিধি ক্রমেই বাড়তে থাকে সেইসাথে আর্থসামাজিক অবস্থারও পরিবর্তন ঘটে। আর এই আর্থসামাজিক পরিবর্তেনের সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ে পতিতা পল্লীগুলি। বাবু সম্প্রদায়ের জীবনযাপন পদ্ধতি, পার্থিব আকাঙ্খা, নারীসঙ্গ লাভের অবৈধ ইচ্ছা পতিতাপল্লীগুলির সংখ্যা হঠাৎ বৃদ্ধির জন্য দায়ী।

এই বৃত্তির কথা আমাদের সমাজে সাহিত্যের মাধ্যমে অনেকাংশে প্রতিফলিত হয়েছে, কারন আমরা জানি সাহিত্য হল সমাজের দর্পণ। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে রচিত সাহিত্যগুলি মূলত প্রহসন নির্ভর ,শুধু তাই নয় এই সাহিত্যগুলিতে পতিতাদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিও যথেষ্ট নেতিবাচক। এই পর্বের সাহিত্যগুলির মধ্যে অন্যতম হল ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'নববাবু বিলাস (১৮২৫)', 'দ্যুতি বিলাস (১৮২৫)', প্যারীচাঁদ মিত্রের লেখা 'আলালের ঘরে দুলাল', কালিপ্রসন্ন সিংহের লেখা 'হুতোম পেঁচার নক্সা'। তবে আমরা বর্তমানে ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের পতিতাবৃত্তি ও তার আর্থসামাজিক অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা করব। মূলত বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্পে এই বৃত্তি ও বৃত্তিধারী মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থা কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে সে সম্পর্কে আলোকপাত করার চেষ্টা করব।

Trisangam International Refereed Journal (tirj)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume-3, Issue-II, April 2023, tirj/April23/article -12
Website: www.tirj.org.in, Page No. 89-95

Discussion

ভূমিকা : পতিতাবৃত্তি পৃথিবীর সব থেক পুরোনো পেশা গুলির মধ্যে একটি। বলা যেতে পারে, সভ্যতার সূচনা লগ্নের সাথে সাথেই এই পেশার উৎপত্তি ঘটে। পৃথিবীর এমন কোন সভ্য সমাজ নেই যেখানে পতিতা বৃত্তির অস্তিত্ব নেই। বরং এটা বলা ভালো যে পতিতাবৃত্তি ও সভ্যতা যেন একই মুদ্রার দুটি দিক। তা সত্ত্বেও সভ্য সমাজ ও সভ্য সমাজে থাকা মানুষরা কখনোই পতিতা বৃত্তিকে সেইরূপ সম্মান দেয় নি, বরং এই পেশা ও এই পেশার সাথে যুক্ত মানুষদের তারা চিরকালই অবজ্ঞার চোখে দেখেছে। এই প্রসঙ্গে যে প্রশ্নটি উঠে আসে তা হল আক্ষরিক অর্থে পতিতা বৃত্তির অর্থ কী? খুব সহজ ভাবে বললে, যখন অর্থ বা কোনো বস্তুর বিনিময়ে পুরুষ ও নারী মিলিত হয়, তখন সেই মিলনকেই পতিতা বৃত্তি বলা যেতে পারে। অন্যভাবে বললে নারী একাধিক পুরুষের সাথে যদি অর্থের বিনিময়ে মিলিত হয়ে শারীরিক সুখ প্রদান করে তাহলে সেই পেশাকে পতিতা বৃত্তি বলা যাবে। যদিও অবৈধ প্রেম বা পরকীয়া পতিতাবৃত্তির মধ্যে পড়ে না কারণ তা শুধুমাত্র নারী পুরুষের যৌথ সম্মতিতে স্থাপিত হয়, অর্থ বা বস্তুর বিনিময়ে নয়।

যদিও সুমন্ত ব্যানার্জি এ বিষয়ে কিছুটা ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। তার মতে পতিতা বৃত্তি ও অনান্য কায়িক শ্রমের মতই সমাজে নুন্যতম সন্মানের আধিকারী ও অর্থ উপাজনের একটি মাধ্যম মাত্র। কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষ নারীকে নিজস্ব সম্পত্তি বলে মনে করে। বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠান ও প্রজনন ব্যবস্থায় নারীর দৈহিক শুচিতার উপর জোর দেওয়া হয়। ফলস্বরুপ এই বৃত্তি ধারী মানুষরা সমাজের মুল স্রোত হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।[১] সভ্যতার আদি লগ্নে প্রাগৈতিহাসিক যুগে পৃথিবীতে কোন বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ছিল না। পুরুষ ও নারী অন্যান্য প্রাণীদের মতোই প্রাকৃতিক নিয়মে একে অপরের সাথে মিলিত হত। পরে ধীরে ধীরে মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনযাপন শুরু করল। বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীগুলো নিজেদের মধ্যে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করতে শুরু করল। যদি আদিম মানুষ ঘনঘন তার সঙ্গী পরিবর্তন করত। এই সময় থেকেবিভিন্ন গোষ্ঠীগুলির মধ্যে নারীকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ শুরু হল। ফলস্বরূপ নারীরা ধীরে ধীরে সম্পদ হিসাবে পরিগনিত হতে শুরু করে। অর্থাৎ এইবার নারীর ওপর পুরুষতান্ত্রিক সমাজের আধিপত্য কায়েমের ইতিহাস শুরু হল।

এরপর ধীরে ধীরে সভ্যতা কত উন্নত হয়েছে, গ্রামীণ সভ্যতার পাশাপাশি বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব ঘটেছে। নারীদের জন্য অর্থনৈতিক ক্ষেত্র নিষিদ্ধ হয়েছে। নারী হয়েছে গৃহবন্দী, বিবেচিত হয়েছে পুরুষের সম্পদ রূপে। উন্নত নগর সভ্যতার হাত ধরে মানুষের হাতে অর্থসম্পদ উদবৃত্ত হয়েছে এবং পুরুষতান্ত্রিক সমাজে অবদমিত যৌন ইচ্ছার প্রকাশ ঘটেছে পতিতাবৃত্তি নামক পেশার মাধ্যমে। প্রাচীনকাল থেকেই ভারতীয় সমাজ পুরুষতান্ত্রিক। সেখানে নারীহরণ, ধর্ষণ, দান সবই খুব সাধারণ ঘটনা। পুরুষের শয্যাসঙ্গিনী হয়ে তাকে তৃপ্ত করাই যেন মেয়েদের একমাত্র লক্ষ্য। তৎকালীন সমাজে দেহ ব্যতীত নারীর মানসিক উৎকর্ষতা খুব একটা গ্রহনীয় বিষয় ছিল না।

ঋকবৈদিক যুগ হতেই ভারতীয় সমাজে পতিতা ও পতিতা বৃত্তির অস্তিত্বের কথা আমরা জানতে পারি। ঋকবৈদিক সাহিত্যে সাধারণী, সামান্য প্রভৃতি নামের উল্লেখ আছে। পরবর্তী বৈদিকসাহিত্যে গণিকা, বন্ধকী, রূপজীবা, বারাঙ্গনা প্রভৃতি নামগুলি হতে পতিতাবৃত্তির কথা জানা যায়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে গণিকা ও গণিকাবৃত্তির বিস্তৃত আলোচনা আছে। এ ভাবেই প্রাচীন হতে মধ্য সব যুগেই এই পেশা তার অস্তিত্ত্ব বজায় রেখেছে।[২] তৎকালীন সমাজে এই বৃত্তির কথা সমাজে সাহিত্যের মাধ্যমে অনেকাংশে প্রতিফলিত হয়েছে। তবে আমি বর্তমানে ঊনবিংশ-বিংশ শতকে ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের পতিতাবৃত্তি ও তার আর্থ সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা করব। মূলত বাংলা সাহিত্যে এই বৃত্তি ও বৃত্তিধারী মানুষের কথা কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে সে সম্পর্কে আলোকপাত করবো। ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার পর বাংলায় ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থাতে পরিবর্তন ঘটে। বাংলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হয়। জমিদার ও মধস্বত্ত্বভোগী মানুষের হাতে উদ্বৃত্ত অর্থ আসে আর সেই সাথে তাদের সুযোগ হয় ইউরোপীয়দের সংস্পর্শে নিজেদের ক্ষমতা, প্রভাব, প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করার। এইসময় সমাজে ভদ্রশ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। ভদ্রলোক অর্থাৎ যে ব্যক্তির আচার আচরণ ভদ্র, সংযত ও মার্জিত। এই শ্রেণীর মানুষ স্বভাবতই সমাজে উচ্চবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। ঔপনিবেশিক আমলে এই শিক্ষিত ভদ্রলোক সম্প্রদায়ের যথেষ্ট প্রভাব ও প্রতিপত্তি সমাজে পরিলক্ষিত হয়। এরা ইউরোপীয় শিক্ষা, ধ্যান ধারণার বশবর্তী

হয়ে পরিচালিত হয়। জন্ম হয় বাবু সম্প্রদায়ের। এই বাবু ও পতিতা একে অপরের পরিপূরক ছিল। বাবু সম্প্রদায়ের চাহিদার কথা মাথায় রেখেই পতিতাবৃত্তি এই সময় হতে তার সংকীর্ন গন্ডি অতিক্রম করে হঠাৎ করেই কলকাতা নগরীর আলোচ্য বস্তু বা বিষয়ে পরিণত হয়। এইসময় হতেই কলকাতা শহর ও তার সংলগ্ন মফঃস্বল শহরের পরিধি ক্রমেই বাড়তে থাকে। আর এই আর্থসামাজিক পরিবর্তেনের সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ে পতিতা পল্লীগুলি।

নতুন প্রজন্মে বাবু সম্প্রদায়ের ক্রমবর্ধমান চাহিদা; পতিতাপল্লীগুলির সংখ্যা হঠাৎ বৃদ্ধির জন্য দায়ী। চলতি ভাষায় এরা কলকাতার বুকে 'বেশ্যা' নামে পরিচিত ছিল আর এদের কাছে যে সমস্ত ব্যক্তিবর্গ শারীরিক চাহিদাপূরনের জন্য আসত তারা খদ্দের বা 'বাবু' নামে পরিচিত ছিল। তৎকালীন সমাজে 'বাবু' নামটি দুইভাবে ব্যবহৃত হতো।একদিকে এই শব্দটি দ্বারা যেমন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্বপূর্ণ, শিক্ষিত সম্প্রদায়কে বোঝানো হত তেমনি এই শব্দটি তাচ্ছিল্যসহকারে বিত্তবানের বেয়াড়া অবাধ্য পুত্রদের প্রতিও ব্যবহৃত হতো যারা পানশালা, পতিতালয়ে যথেচ্চ অর্থব্যয় করতো। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর বাবু সম্প্রদায়ই হল পতিতাদের প্রকৃত পৃষ্ঠপোষক।[৩]

তৎকালীন বাংলা সাহিত্যগুলো বাবু সম্প্রদায় সম্পর্কে আমাদের যথেষ্ট তথ্য প্রদান করে।এই পর্বের সাহিত্য গুলির সম্ভবত খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি ধারা হল প্রহসন ও রঙ্গনাট্য রচনা। আর এই ধারার সুত্রপাত হয় ভবানী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এর হাত ধরে।এই সময়কার নামকরা প্রহসন গুলির মধ্যে ঊনবিংশ শতকে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এর লেখা প্রহসনগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নামকরা কবি ও সাংবাদিক ছিলেন তার রচিত 'নববাবু বিলাস' (১৮২৫), 'দ্যুতি বিলাস' (১৮২৫), পতিতা ও বাবু সম্প্রদায়েরজীবন সম্পর্কে বহু তথ্য প্রদান করে। এই প্রহসনে তৎকালীন বিত্তবানের অশিক্ষিত, বেয়ারা সন্তান কিভাবে আকণ্ঠ মদ্যপান ও পতিতা সঙ্গ করে বেড়াত তারই বিস্তৃত বর্ণনা আছে। বাবুসম্প্রদায়ের বাস্তব বুদ্ধির অভাব ও চারিত্রিক দোষ ত্রুটি এ সবই তার রচনাতে ফুটে উঠেছে। তার অপর একটি গ্রন্থের নাম 'কলিকাতা কমলালয়'। এই গ্রন্থেও তিনি তৎকালীন সামাজিক অবস্থা ও কুপ্রথাগুলি কে আক্রমণ করেন। এখানেও ন্যায়নীতিহীন ধনীসন্তান, মোসাহেবদের চাটুকারিতা, বাবুদের অমিতব্যায়িতা ইত্যাদি বিষয়গুলি সুতীব্র ভাবে ফুটে উঠেছে। এছাড়াও অন্যান্য সাহিত্যের মধ্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের লেখা 'আলালের ঘরে দুলাল', কালিপ্রসন্ন সিংহের লেখা 'হুতোম পেঁচার নক্সা', মাইকেল মধুসূদন দত্তের লেখা, 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রভৃতি লেখনীগুলির গুরুত্ব অপরিসিম। এই প্রহসন গুলি উনিশ শতকের বাংলার সামাজিক চিত্র নির্মাণে উল্লেখ্য ভুমিকা রাখে। ইংরেজি শিক্ষাভিমানী, অতিপ্রগতিশীল অসামাজিক বেলেল্লাপনায় লিপ্ত যুবক সম্প্রদায়ের নিখুঁত চিত্র ফুটিয়ে তোলে। স্বচ্ছ ও সুস্থ সমাজ গঠনে প্রচলিত নৈতিক ভাবে অধঃপতিত সামাজিক কুপ্রথার মূলে কুঠারাঘাত করে এই প্রহসন গুলি। এই সময়কার বটতলার প্রহসন গুলির ও অন্যতম প্রিয় বিষয় ছিল বাবু ও পতিতাদের সম্পর্ক। সমসাময়িক নানা সামাজিক কুপ্রথা যেমন মদ্যপান, বেশ্যাবৃত্তি ইত্যাদি স্থান পেয়েছিল। এগুলি নিঃসন্দেহে সাহিত্যের উৎকর্ষতার নিরীখে পূর্ববর্তী ভবানীচরন বন্দ্যোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসুদন দত্ত অথবা প্যারীচাঁদ মিত্রের প্রহসনের সাথে তুলনীয় ছিল না কিন্তু সমাজের সাধারন মানুষ যেমন কেরানীকুল, ছোট ব্যবসায়ী, স্বল্প শিক্ষিতা মহিলাগন, মজুর এদের কাছে বটতলার সাহিত্য এক অন্যমাত্রা পেয়েছিল। ২০ থেকে ৪০ পৃষ্ঠার ছোট ছোট এই বইগুলি ১০০০ হতে ২০০০ কপি প্রকাশিত হতো। এইগুলি যারা পাঠ করতেন তাদের মতো করেই সহজ সরল ভাষাই এইগুলি রচিত হয়েছিল। ইংরেজি জানা, উচ্চশিক্ষিত, আধুনিক বা উচ্চমধ্যবিত্তের জন্য এই বটতলার সাহিত্য ছিল না।[৪]

এই পর্বের সাহিত্যগুলো (উচ্চ বর্গের সাহিত্য চর্চাই হোক বা বটতলার) পর্যালোচনা করলে দেখা যায় পতিতা জীবিকাধারী মেয়েরা যেন সমাজে পরজীবী শ্রেণী, যারা সমাজের অর্থবান বিত্তবান পুরুষকে শোষণ করেই নিজেদের জীবন নির্বাহ করে। তারা সর্বদাই বিলাস ব্যাসন পূর্ণ জীবন যাপন করে। কিন্তু এই পর্বের লেখনীগুলী কোনভাবেই কী আর্থসামাজিক পরিস্থিতি তাদের এই পেশা বেছে নিতে বাধ্য করে সেই সম্পর্কে আমাদের কোনরূপ তথ্য প্রদান করে না। কারন এইসময় বাঙ্গালী সমাজের একটা বড় অংশ ইউরোপীয় চিন্তাভাবনা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। এখানে ইউরোপীয় চিন্তাভাবনা বলতে মূলত ভিক্টোরিয়ান নীতি বোধের কথা বলা হচ্ছে। ১৮৩৭ সালে রানী ভিক্টোরিয়া

অষ্টাদশী তরুণী হিসেবে সিংহাসনে বসেন। আর এই ১৮৩৭ হতে ১৯০১ সাল পর্যন্ত সময়কাল ভিক্টোরিয়ান যুগ নামে পরিচিত। ভিক্টোরিয়ান সময়কালে নারীদেহ, নারীদেহের শুচিতা, যৌন পবিত্রতা রক্ষা ইত্যাদি বিষয়গুলি কে এক আদর্শ হিসেবে মনে করা হতো। শুধু দেহ নয় ভাষা, কথাবার্তা, ব্যাবহার, ছাপার অক্ষর সবই যেন যৌনগন্ধী বিষয় হতে মুক্ত হয়। এই চিন্তাধারাই হয়ত তৎকালীন সাহিত্যিকদের কিছুটা প্রভাবিত করে তাই এই পর্বের সাহিত্য পতিতাদের সম্পর্কে আমাদের মনে নেতিবাচক ধারণার জন্ম দেয়।[৫]

সুতরাং পতিতা বৃত্তিকে কেন্দ্র করে তৎকালীন সমাজের ভদ্র শ্রেনীর মানুষের মধ্যে একটি দ্বৈতসত্ত্বা কাজ করছিল। নীতিগত দিক হতে পতিতাদের সামাজিক উচ্ছেদ প্রয়োজনীয় ছিল অথচ বাবুসম্প্রদায় থেকে শুরু করে মধ্যবিত্ত উকিল, ব্যাবসায়ী, সকলেই তাদের গ্রাহক ছিল। সুতরাং সমাজের প্রয়োজনীয়তার কথা মাথাই রেখে তাদের ঠাই হয় সমাজের প্রান্তে।

এই সমস্ত পতিতাদের খদ্দের যে শুধুমাত্র ভারতীয়রাই ছিলেন তা নয় বরং বলা ভাল ব্রিটিশ সৈন্যদলের একটা বড় অংশ এদের সাথে সম্পর্ক রাখতেন। খুব স্বাভাবিক ভাবেই তারা নানাভাবে যৌনরোগ সিফিলিসিস, গনোরিয়া ইত্যাদিতে আক্রান্ত হতেন। তাই এই সমস্ত রোগকে নিয়ন্ত্রন করতে ব্রিটিশ সরকার 'Contagious Disease Act' – CDA from 1868 পাশ করেন।[৬] এর পরেই বাংলায় পতিতাদের নাম নথিভুক্তকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়। এই প্রক্রিয়া শুরু হলে বোঝা যায় ঊনবিংশ শতকে তাদের বৃদ্ধির হার কতটা দ্রুত ছিল। আসলে ব্রিটিশ সরকারের উদ্দেশ্য ছিল পতিতাবৃত্তিকে একটি সংগঠিত ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা। এই সময় হতেই ব্রিটিশ সরকার পতিতাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার নামে তাদের ওপর অত্যাচার করতে শুরু করেন।' লক হসপিটাল' এ তাদের সাথে পশুর মতো ব্যবহার করা হত।[৭] এমতবস্থায় এই 'চৌদ্দ আইন' এর অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচার জন্য বহু পতিতা কোলকাতা নগরী পরিত্যাগ করতে শুরু করেন। এই আইন কতটা আতঙ্কের জন্ম দেয় তার পরিচয় পাওয়া যায় পতিতাপল্লীর নিজস্ব কিছু ছড়া বা কবিতায় –

"মাছ খাবি তো ইলিশ
নাঙ ধরবি তো পুলিশ।"[৮]

এমতবস্থায় বাঙ্গালী ভদ্রলোক ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় সমাজে পতিতাদের আস্তিত্ব রক্ষা কতটা প্রয়োজন তা বুঝতে সক্ষম হন। অর্থাৎ সমাজে এই বৃত্তিকে ঘৃণা, অবজ্ঞা অথবা তাচ্ছিল্য করা যায় কিন্তু এর গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। ধীরে ধীরে সমাজের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের একটি অংশ তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠেন। রূপচাঁদ পক্ষী তাদের হয়ে লেখেন –

"কারে বলিব বনমালী! এ দুঃখের কথা।
হল চৌদ্দ আইন বড়ই কঠিন বল যাই কথা।
ভেবে ভেবে গুমরে মরি, এ কি আইন হল জারী
দিগম্বরী করিবে যত বারবনিতা।"[৯]

এই সময়কার বটতলার সাহিত্য গুলিতে (চণ্ডীচরণ ঘোষ এর লেখা 'বেশ্যাই সর্বনাশের মূল ১৮৭৩' অথবা জনৈক নাট্যানুরাগী রচিত 'বেশ্যানুরক্তি বিষম বিপত্তি', ১৮৬৩) একদিকে যেমন বেশ্যা বা পতিতাদের প্রতি সামাজিক নিন্দা বা বিরুদ্ধাচরণের চিত্র ফুটে উঠেছিল তেমনি রূপচাঁদ পক্ষী, শ্রীগিরিশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় (বেশ্যা গাইড', ১৮৬৮), শ্রী অঘোরচন্দ্র ঘোষ (পাঁচালি কমলকলি', ১৮৭২) এর মতো ব্যাক্তিগন তাদের প্রতি হওয়া অন্যায় অবিচারকেও তুলে ধরতে সক্ষম হন। পতিতারা নিজেরাও এইসময় নিজেদের কথা লিখতে শুরু করেছিলেন। এগুলো বেশীরভাগই ছিল আত্মকথা মুলক। এপ্রসঙ্গে বিনোদিনী দাসীর লেখা 'আমার কথা', মানদা দেবীর লেখা 'শিক্ষিত পতিতার আত্মচরিত', এর কথা বলা যায়। এছাড়াও আছে সুকুমারী দত্তের লেখা আত্মজীবনী মূলক নাটক 'অপূর্ব সতী'। এই সমস্ত রচনা গুলিতে তারা কিন্তু তাদের জীবন সংগ্রাম, উত্থান পতনের চিত্র ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হন। আর এই পরিবর্তিত চিন্তাভাবনার প্রতিফলনই পরবর্তী সময়ের উচ্চবর্গের নিয়ন্ত্রাধীন বইপত্র ও তাদের লেখনীতে ফুটে ওঠে। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখকগন যারা পতিতাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন তাদের লেখনীতে বিশেষ করে বাংলা সাহিত্যের ছোট

গল্পে পতিতাদের আর্থসামাজিক অবস্থানের বাস্তবচিত্র আঁকতে সমর্থ হন। বাংলা সাহিত্যে গতানুগতিক ধনী, দেহ সর্বস্ব, পুরুষ শিকারী, লোভীর চরিত্র হতে বেরিয়ে এসে পতিতাদের রক্তমাংসের নারী হিসেবে চরিত্রায়ন শুরু হয়।

ঊনবিংশ শতকে হঠাৎ করে পতিতাবৃত্তির ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধির পেছনে মূলত তিনটি আর্থ সামাজিক কারণ দায়ী ছিল। আমরা আগেই বলেছি ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার পর ভারতীয় সমাজ ও অর্থনীতিতে পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। এ প্রসঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩) এর কথা বলা যায়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে সূর্যাস্ত আইনের ফাঁসে পড়ে সেই সময় বহু জমিদারী বিক্রি হয়ে যেত অথবা তাদের ঘনঘন হাতবদল ঘটত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে এক নতুন জমিদার শ্রেণীর জন্ম হয় যারা ভূমি বা জমিদারীতে গরীব কৃষকদের সাথে তেমন কোন সম্পর্ক রাখত না বরং তারা শুধুমাত্র জমি থেকে আগত রাজস্ব নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতেন।

ফলে এই দুই শ্রেণীর মাঝে জন্ম হয় মধ্যসত্ত্বভোগী শ্রেণীর। আর এই মধ্যসত্ত্বভোগী শ্রেণীর সীমাহীণ শোষণ কৃষকদের ভূমি ভিটে হতে উৎখাত করে ছাড়ত। জন্ম হল নতুন ভূমিহীন কৃষক শ্রেণীর। এই নতুন ভূমিহীন কৃষক শ্রেণী খাদ্য বস্ত্রের জন্য কলকাতা শহরে আসতে শুরু করল।[১০] চরম আর্থিক সঙ্কটের সম্মুখীন হয়ে এই সমস্ত পরিবারের মেয়েরা বাধ্য হয়ে পতিতাবৃত্তিকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করত। এদের মধ্যে অনেকে কর্মসহায়িকা (ঝি) হিসাবেও অর্থবান ব্যক্তির বাড়িতে কাজ করতে শুরু করে। উদাঃ বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এর লেখা ছোটগল্প 'হিংয়ের কচুরি'।[১১] এই গল্পের প্রধান চরিত্রের নাম কুসুম যে প্রথম যৌবনে পতিতাবৃত্তি গ্রহন করলেও পরে যৌবন অন্তহীত হলে ঝি হিসেবে কাজ করতে শুরু করে জীবিকা নির্বাহের জন্য। সুতরাং অসীম ধনসম্পদ ও বিলাসব্যাসনে জীবন যাপন করা সকল পতিতার ভাগ্যেই যে থাকেনা তার প্রমান বা সাক্ষ্য করে এই গল্পটি। এই গল্পে লেখক পতিতাপল্লী ও গৃহস্ত পাড়ার সহাবস্থানের চিত্র এঁকেছেন। দেখিয়েছেন শহরের বৃহত্তর পরিবেশ এ নানা পেশার লোক সংকীর্ণতা ত্যাগ করে কিভাবে একত্রে বসবাস করেন। যদিও এই পতিতাদের সাথে মেলামেশা অথবা তার বাড়ি যাবার জন্য কথক কে বহুবার তার মা ভৎসনা করেন কিন্তু তা সত্ত্বেও শৈশবে কথক ও কুসুমের মধ্যে এক নিষ্পাপ আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ফলে বহু বছর পরেও সেই আত্মিক সম্পর্কের টানেই কলকাতায় চাকরি সুত্রে এসে কথক কুসুমকে খুঁজে তার সাথে দেখা করেন। এছাড়া রয়েছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এর লেখা 'নমুনা' নামক ছোট গল্পটি। এই গল্পে বাবা দারিদ্র্যের জ্বালা সইতে না পেরে নিজ কন্যা কে বিক্রি করে দিতে বাধ্য হন। দুর্ভিক্ষ, অনাহার, ম্যালেরিয়ার প্রকোপ, জোয়ান পুত্রের মৃত্যু এই সবই বাধ্য করে গ্রাম হতে মেয়েদের শহরে আসতে এবং পতিতা বৃত্তি কে পেশা হিসেবে গ্রহন করতে।

দ্বিতীয় সামাজিক কারণের মধ্যে অন্যতম হল তৎকালীন অল্পবয়সী কুলীন ব্রাহ্মনের বিধবা রমনীদের পদস্খলন ও শেষপর্যন্ত নিরুপায় এই পেশাকে জীবিকা রূপে গ্রহণ। ১৮২৯ খ্রীঃ রাজা রামমোহন রায়ের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের সদিচ্ছাতে চরম নিষ্ঠুর সতীদাহ প্রথা ভারতে বন্ধ করা সম্ভব হয়। কিন্তু গোড়া ব্রাহ্মন ও ভারতীয়রা এই নিষিদ্ধ করণকে সহজভাবে মেনে নিতে পারেননি। তাদের ধর্মীয় ঐতিহ্যের সারবত্তহীনতা বিশ্বের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়লে তার দায় গিয়ে বর্তায় অল্পবয়সী বিধবা রমণীদের উপর। তাদের জন্য বৈধব্যের কৃচ্ছসাধন কঠোর হতে কঠোরতর হয়। তাই আশাপূর্ণাদেবীর লেখা উপন্যাস 'প্রথম প্রতিশ্রুতিতে' বিধবা পিসির জীবনযাপন এর এক অন্যতম উদাহরণ।

যাই হোক বহুক্ষেত্রেই এই কঠোর কৃচ্ছসাধন ওই সমস্ত মেয়েদের ক্ষেত্রে পালন করা সম্ভব হত না। অনেকের গুপ্ত প্রণয়ী থাকত যাদের সাথে তারা সমাজ ও কুল পরিত্যাগ করে কলকাতা নগরীতে এসে বসবাস করতে শুরু করে।[১২] কিন্তু কিছুদিন পরেই প্রেমিক প্রবরের মোহভঙ্গ হয়। বহুক্ষেত্রেই ওই অসহায় নিরুপায় রমণীকে পরিত্যাগ করে যে নিজ সমাজ সংসারে ফিরে যায়।স্বাভাবিকভাবেই অসহয়া সম্বলহীন ওই বিধবা রমণীর স্থান হয় পতিতালয়ে। উদাহরণ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'বিচারক' নামক ছোটগল্প,[১৩] সেখানে 'ক্ষীরোদা' নামক চরিত্রটি এক অল্পবয়সী বিধবার যে প্রেমিক-দ্বারা প্রতারিত হয়ে পতিতা বৃত্তিকে পেশা হিসেবে গ্রহন করেন। নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে পতিতাবৃত্তি গ্রহনের পর অপর যে ব্যাক্তিকে বিশ্বাস করে নিজের সঞ্চিত অর্থ ও গহনা তুলে দেয় সে ব্যাক্তিও সমস্ত জিনিস চুরি করে পালায়। এই ঘটনা আমাদের প্রিয়নাথ মুখপাধায়ের 'দারগার দপ্তর' এর ত্রৈলোক্য এর জবানবন্দি তে 'কুসুম' এর

কথা মনে পরায়।[১৪] প্রতারিত হয়ে কুসুম কুয়ো তে শিশুকন্যা সমেত ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করে কিন্তু আবার ও নিয়তির ফেরে সে বেঁচে যায় কিন্তু তার শিশু কন্যাটি মারা যায়। যে প্রেমিক ক্ষীরোদ কে এই বৃত্তি বা পেশা বেছে নিতে বাধ্য করে সেই পরবর্তী সময়ে ব্যারিস্টার হয়ে তার কৃতকর্মের জন্য শাস্তি প্রদান করে। নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাস হয়তো একেই বলে। বেশ্যা বা পতিতা শুধু ঠকায় না স্থান বিশেষে সে নিজেও ঠকে যায় তার অন্যতম উদাহরণ এই গল্পটি। অথবা শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় এর লেখা 'পতিতার পত্র' নামক ছোট গল্পটি। সেখানে সুলোচনা নামক একটি কুলীন ব্রাহ্মনের পতিতা বিখ্যাত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব দ্বারা প্রতারিত হন।[১৫] আর তৎকালীন সময়ে বিখ্যাত রাজনৈতিক ব্যাক্তিত্বের সাথে যে পতিতাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল তার প্রমান মানদা দেবীর আত্মকথা তেও পাওয়া যায়।[১৬] বহুক্ষেত্রে এই সমস্ত বিধবা রমণীগন খুব নিকট আত্মীয়দের দ্বারা যৌন হেনস্থা ও লাঞ্ছনার শিকার হন।

এছাড়া বহু বিবাহিত রমণী শ্বশুর বাড়ীর লোকেদের দ্বারা পণ দানের জন্য বা পুত্রসন্তানের জন্ম দান দিতে না পারলে তার জন্য অত্যাচারিত হন, শুধু তাই নয় শ্বাশুড়ী, ননদ এদের দূরবাব্যহার এর ফলেও বহু মেয়ে অন্য জায়গায় বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে এবং ভাগ্য পরিহাসে তাদের স্থান হয় পতিতালয়। এমনই একটি ছোট গল্প হল বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'বিপদ', এই গল্পের প্রধান চরিত্র 'হাজু' অন্ন,বস্ত্রের অভাব এবং শ্বশুর বাড়ীর অত্যাচার এ অতিষ্ঠ হয়ে পতিতাবৃত্তি কে পেশা হিসেবে বেছে নিতে বাধ্য হয়।[১৭] এবং এর জন্য তার কোন অপরাধ বোধ নেই বরং নিত্যদিন অভাব এর জ্বালা সহ্য করার থেকে এই পেশাকে অবলম্বন করে যে সে ভাল আছে তা লেখক সুন্দর ভাবে নিজ উপার্জনে কেনা সামান্য চায়ের পেয়ালা অথবা চা করার বিষয়টির সাহায্যে দেখিয়েছেন। পতিতা বৃত্তিকে যতই সমালোচনা করা হোক না কেন কিন্তু এ কথা অস্বীকার করা যাবে না যে পতিতারাই উনিশ শতকে সর্বপ্রথম আর্থিক স্বাধীনতা লাভ করে। নিজ উপার্জন এ কিছু ক্রয় করার খুশি বা আনন্দ কে লেখক খুব নিপুণতার সাহায্যে ফুটিয়ে তুলেছেন 'হাজু' র ঘর সাজানোর জিনিস এর মাধ্যমে। এই বিষয়টি তৎকালীন সময়ের নিরিখে বেশ আলাদা কারন এখানে লেখক সমাজের নীতি বোধকে নয় বরং মানুষের প্রাথমিক চাহিদার বিষয়কে গুরুত্ব দিয়েছেন।

পরবর্তী পর্যায়ের লেখনী হতে পতিতাদের প্রতি সমাজ ও সাহিত্যিকদের দৃষ্টিভঙ্গির যে পরিবর্তন ঘটেছে তা জানা যায়। এই পর্যায়ে পতিতাদের প্রতি সাহিত্যিকদের দৃষ্টিভঙ্গির একটা আমূল পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। এই দ্বিতীয় পর্বের লেখাগুলো বিশ্লেষন করলে তাদের আর্থসামাজিক অবস্থান আমাদের কাছে পরিস্ফূট হয়ে ওঠে। ভিন্ন ভিন্ন আর্থসামাজিক প্রতিবন্ধকতা কীভাবে তাদের বাধ্য করে এই পেশাকে বেছে নিতে সেই সম্পর্কে বহু তথ্য প্রদান করে। সুতরাং উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলা সাহিত্যে পতিতাদের অবস্থান, আর উনিশ শতকের শেষার্ধে অথবা বিংশ শতকের প্রথমার্ধে তাদের যে অবস্থান দেখা যাছে তাতে একটি আমূল পরিবর্তনের ধারা পরিলক্ষিত হয়। নাটক ও প্রহসনে পতিতাদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি যথেষ্ট নেতিবাচক। যদিও ব্যাতিক্রম রয়েছে। পরবর্তী সময় এ ছেড়ে অন্যত্র পলায়ন করতে শুরু করেন তখন সমাজে তাদের প্রয়োজনীয়তার কথা তৎকালীন সমাজ উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। তাই প্রহসন গুলিতে যেমন তাদের চিত্রায়ন পরিবর্তিত হয় তেমনি ছোটগল্প গুলি পতিতা ও পতিতাবৃত্তি কে কেন্দ্র করে রচিত হতে শুরু করে। সাহিত্যে প্রান্তিক, অপ্রয়জনীয় নেতিবাচক চরিত্রের বদলে মুখ্য চরিত্রে তাদের উত্তরণ তৎকালীন সমাজে তাদের গুরুত্বকেই প্রমান করে। শুধু তাই নয় সাহিত্যগুলি তাদের আর্থসামাজিক অবস্থান সম্পর্কেও বাস্তব চিত্র তুলে ধরে। সাহিত্যে তাদের উত্তরন; একদিকে যেমন সমাজে তাদের গুরুত্ব কে স্বীকার করে নেয়, তেমনি সমাজে শিক্ষিত, মধ্য থেকে উচ্চ সকল শ্রেণীর মানুষ পতিতাবৃত্তি কে কেন্দ্র করে যে দ্বিচারিতা মনোভাব পোষণ তাও চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। সুতরাং পতিতা ও পতিতাবৃত্তি ধারী মানুষদের ঘৃণা অথবা অবজ্ঞা করলেও সমাজে তাদের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না।

তথ্যসূত্র :

১. Banerjee, Sukumar, 'Dangerous Outcast' Seagul, Calcutta, 2019, pp. 19 - 21
২. ভট্টাচার্য, সুকুমারী, 'প্রাচীন ভারত সমাজ ও সাহিত্য', আনন্দ, কলকাতা, ১৪২০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫৯

৩. 'Dangerous Outcast', (পূর্বোক্ত) পৃ. ৭৯ – ৮১
৪. বিশ্বাস, অদ্রিশ এবং আনিল আচার্য সম্পাদিত বাঙালির বটতলা, প্রথম খণ্ড, অনুস্টুপ, কোলকাতা, ২০১৩, পৃ. ২৪৭ - ২৪৮
৫. চক্রবর্তী, সুদেষ্ণা, 'ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালি জীবনে ভিক্টোরিয়ান প্রভাব', নামক প্রবন্ধ, স্বপন বসু ও ইন্দ্রাজিৎ চৌধুরী সম্পাদিত পুস্তক 'উনিশ শতকের বাঙ্গালি জীবন ও সংস্কৃতি', পুস্তকবিপণী, কলকাতা ২০১৯, পৃ. ১০৯ – ১১০
৬. 'Dangerous Outcast' (পূর্বোক্ত) p. 73
৭. ভট্টাচার্য, মৌ সম্পাদিত, 'বেশ্যাপাড়ার পাঁচটি দুর্লভ সংগ্রহ', রত্নাবলী, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ৭
৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমন্ত, 'অশ্রুত কণ্ঠস্বর একলব্য', কলকাতা, ২০২১, পৃ. ১১০
৯. 'বেশ্যাপাড়ার পাঁচটি দুর্লভ সংগ্রহ', (পূর্বোক্ত) পৃ. ১৫
১০. সেন, অশোক, 'বাংলার অর্থনীতি, বাঙ্গালির উনিশ শতক' নামক প্রবন্ধ, স্বপন বসু ও ইন্দ্রাজিৎ চৌধুরী সম্পাদিত পুস্তক 'উনিশ শতকের বাঙ্গালি জীবন ও সংস্কৃতি', পুস্তকবিপণী, কলকাতা ২০১৯, পৃ. ৪৪
১১. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভুতিভূষণ, 'বিভূতি রচনাবলী' (৬ষ্ঠ খণ্ড), মিত্র ঘোষ পাবলিশার্স, কোলকাতা, ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৬৯
১২. 'অশ্রুত কণ্ঠস্বর', (পূর্বোক্ত) পৃ. ৬২
১৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'বিচারক', রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ও সিদ্ধাথ রায় সম্পাদিত 'নিশি পদ্মের মধু', সোমিলা প্রেস অ্যান্ড পাব্লিকেশন, ২০১৪, পৃ. ০৬
১৪. 'অশ্রুত কণ্ঠস্বর', (পূর্বোক্ত) পৃ. ৯৫
১৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু, 'পতিতার পত্র', রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ও সিদ্ধাথ রায় সম্পাদিত 'নিশি পদ্মের মধু', সোমিলা প্রেস অ্যান্ড পাব্লিকেশন, ২০১৪, পৃ. ৫০ - ৫১
১৬. দেবী, মানদা, 'শিক্ষিতা পতিতার আত্মচরিত', সংজ্ঞা, কোলকাতা, ১৩৯২ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৯২
১৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভুতিভূষণ, 'বিভূতি রচনাবলী' (৫ম খণ্ড), মিত্র ঘোষ পাবলিশার, কোলকাতা, ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩৫